ছবি ঃ মো. রফিকুল ইসলাম

নীলকণ্ঠ-সর্বংসহা সুন্দরবন

অমলেশ চৌধুরী

আমার তো মনে হয় 'শুধু সুন্দরবন চর্চা'-র সৌজন্যে আপামর বাঙালীর কাছে সুন্দরবন ম্যানগ্রোভের ইতিবৃত্তান্ত জলভাত হয়ে গেছে। তাছাড়া সুন্দরবন এখন সেরা ইকোট্যুরিজম ডেস্টিনেশন, সবুজ লবণাম্বু বাদাবন বনানী আর বাঘ-হরিণ দেখার লোভে। হাজারো নদী-নালায় ঘেরা দ্বীপময় সুন্দরবনে শুধু এপার বাংলায় প্রায় লাখ চল্লিশেক লোকের বসতি, আইলার মত ঝড়-ঝঞ্ঝা আর বাঁধ ভাঙা বন্যার সঙ্গে সমঝোতা করে। দীর্ঘ ২০০-২৫০ বছরের বসতিতে সুন্দরবনের আর্থসামাজিক অবস্থার তারতম্য ঘটেছে, বসতি স্থাপন করেছেন নানারকম জীবিকার মানুষ। জমিদারি প্রথা উধাও হলেও লব্ধ প্রতিষ্ঠ বিত্তবান, মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত ও গরীব ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর সমাহার দেখা যায় এপার বাংলা ওপার বাংলা দুই সুন্দরবনেই।

কিন্তু এই জনকলরব মুখরিত সুন্দরবনের বাইরে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ আশ্রিত সুন্দরবনের যে আরো একটা বিশ্বপরিচিতি আছে তা হল পৃথিবীর সবথেকে বড় গহন ম্যানগ্রোভ অরণ্য বা বাদাবন বনানী। আন্তর্জাতিক সীমারেখা ভুলে দুই বাংলার প্রায় ২০ হাজার বর্গ কিলোমিটার জুড়ে সুন্দরীধন্য সুন্দরবনে রাজত্ব করে রয়্যাল বেঙ্গল বাঘ, চিতল হরিণ, বুনো শুয়োর, কুমির আর হাজার হাজার পাখির দল। সুন্দরী, গেঁও, গরান, হেতাল, বানি, বকুল কাঁকড়া, ক্যাওড়া, কাঁকড়া, গর্জন, ধুধুল, পশুর, গোলপাতা, খলসি ইত্যাদি প্রায় ৫০-৬০ রকমের ঘন ম্যানগ্রোভ বনানী। আছে নানান প্রজাতির লতাগুল্ম, শৈবাল ও নোনা ঘাস বা ধানি ঘাস। বাদাবনের ভূমিতলে ঠেসমূল ও শ্বাসমূল প্রায় অগম্য করে তোলে গভীর জঙ্গলে সহজ বিচরণ। হরিণ, শুয়োর আর বাঘেরা কিন্তু সহজে চলাফেরা করে। আর এই ম্যানগ্রোভ বনানীর ভূমিতলে বসতি হাজারো প্রজাতির শামুক, ঝিনুক (শুক্তি), কাঁকড়া, পাতাল চিংড়ি, কেঁচো জাতীয় অসংখ্য প্রজাতির পলিকীটসদের। ছোট ছোট খাড়িগুলিতে থাকে বাঁ-হাতি লাল রংয়ের উকা কাঁকড়া আর গাল ফোলানো ডাকুর মাছ। ম্যানগ্রোভ ঠেসমূল

আর শ্বাসমুলে থাকে শৈবালের মোড়ক আর কান্ডে থাকে গেছো কাঁকড়া, গেছো শামুক আর লাইকেন। বনানীর চাঁদোয়ায় (canopy) বাসা বাঁধে অসংখ্য পাখি, বাদুর, সরীসৃপ আর কীটপতঙ্গ। হরেক প্রজাতির ম্যানগ্রোভের পাতায় পাতায় রয়েছে হাজারো প্রজাতির অনুছত্রাক (microfungus) ও অনুমাকড়ের (micromites) সহাবস্থান। ভূমিতলে বসবাসকারী প্রাণিগোষ্ঠী ম্যানগ্রোভের প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ দাক্ষিণ্যে পলি মেশানো জৈব অনুখাদ্য ডেট্রিটাসের ওপর নির্ভরশীল। সংক্ষেপে আমাদের এই সুন্দরবনে বৈচিত্র্যময় জীবজগৎ নিয়েই ম্যানগ্রোভের বিশাল সংসার।

সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভ ছাড়াও রয়েছে এক বিশাল জলাভূমি বা ওয়েটল্যান্ড যা সব নদী-নালা আর খাড়ি-র জল মিলে ঈষৎ লোনা। বলা হয় ব্র্যাকিস ওয়াটার ওয়েটল্যান্ড এবং এটা আবার পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভের জলাভূমি এবং প্রাণবৈচিত্র্যে ভরপুর। পারিপার্শ্ব ম্যানগ্রোভ প্রদত্ত অনুখাদ্যে সমৃদ্ধ এই জলাভূমিতে রয়েছে বহু প্রজাতির প্রচুর মাছ, কাঁকড়া, চিংড়ি ও কস্তুরি প্রাচীর (oyster reef), যার ওপর নির্ভরশীল দুই বাংলার লক্ষ লক্ষ মৎস্যজীবী পরিবার। মাছেদের খাদ্য হিসেবে রয়েছে এই নোনা জলাভূমিতে ভাসমান বহু প্রজাতির অমূল্য অনুজীব - অনুউদ্ভিদ (phytoplankton) এবং অনুপ্রাণি (zooplankton)। এই কারণে সুন্দরবন আমার কাছে Mangrove Biodiversity Hotspot.

সুন্দরবনের অন্য এক চেহারা

জোয়ার-ভাটার দেশ এই সুন্দরবন। চান্দ্রপক্ষ মেনে-প্রতিপদ থেকে অমাবস্যা-পূর্ণিমা প্রতি তিথিতে প্রতিদিন ২৪ঘন্টার দু'বার ম্যানগ্রোভ বনানীর চর অবগাহন অবশ্যই প্রয়োজন, তাদের শারীরবৃত্তীয় প্রয়োজনের তাগিদে। সেই সময় অন্তত চার-পাঁচ ঘন্টার জন্যে জোয়ার জলে ডুবে থাকা বনানীর ভূমিতলের যে প্রাণিজগৎ তারাও স্নাত হয়। কেউ কেউ জোয়ার জল থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে নেয়। আর নদী-নালা থেকে মাছেরা এই সুযোগে ডুবে থাকা ভূমিতলে খাবারের খোঁজে চারণের (grazing) সুযোগ পায়। ভাঁটায় জল সরে গেলে তা রেখে যায় প্রচুর অদৃশ্য অনুখাদ্য (micronutrients), ম্যানগ্রোভ গাছ-গাছালির দৈনিক প্রয়োজনে, আর পলিতটে থাকা প্রাণিদের ডেট্রিটাস খাদ্যের চাহিদা মেটাতে। এই অভিনব এবং সদা চঞ্চল (vibrant) পৃথিবীর সেরা ম্যানগ্রোভ জীববৈচিত্র্যকে বিশ্বসংস্থা UNESCO ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন, যাতে এই অমূল্য জীবজগৎ মানুষের স্বার্থে সুরক্ষিত ও সংরক্ষিত থাকে। সংবেদনশীল সুন্দরবন, ২৪ ঘন্টায় দুবার জোয়ার ভাঁটায় অবগাহন করা এই বাদাবন, যুগ যুগ ধরে নানান রকম প্রতিকূল পরিবেশের সম্মুখীন হয়েছে এবং এখনও হয়ে চলেছে। গত দুই দশক ধরে এই পৃথিবীতে বিশ্বউষ্ণায়নের প্রভাবে নানা প্রতিকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে যেমন সমুদ্র জলস্তরের ক্রমবৃদ্ধি, সমুদ্রের স্বাভাবিক লবণতার মাত্রার হের ফের। এ সবকিছুই ম্যানগ্রোভ বনানীর পরিবেশ স্বাস্থ্যের (Eco-health) পরিপন্থি বলে মনে করেন পরিবেশ বিজ্ঞানীরা। Climate change-এর সঙ্গে সাইক্লোন, হঠাৎ বন্যা, এল নিনো এসব লেগেই থাকে। গত পঞ্চাশ বছর ধরে দেখছি সুন্দরবন সুন্দরবনেই দাঁড়িয়ে আছে, তার জীববৈচিত্রের সংসারকে আগলে ধরে। এসব গেল বাস্তুতন্ত্র ও জীববৈচিত্র্যের উপর ক্ষতিকারক প্রভাবের কথা যার উপসম মানুষের পক্ষে সহজসাধ্য নয়। আমরা শুধু পারি Disaster Management দপ্তরের মাধ্যমে এমন কিছু পরিকাঠামো তৈরি রাখা যাতে দ্রুত সাইক্লোন বা হঠাৎ বন্যায় দুর্দশাগ্রস্থ জনপদকে নিরাপদ আশ্রয়ে রাখার ব্যবস্থা করা যায়, যেমন পাকাপোক্ত বন্যাত্রাণ শিবির বা আশ্রয়স্থল ইত্যাদি। কিন্তু ম্যানগ্রোভ ইকোসিস্টেমের ওপর ধেয়ে আসা এই বিপর্যয় উপদ্রবকে সামাল দেওয়ার কোন পরিকাঠামো Disaster Management দপ্তরের হাতে নেই, শুধুমাত্র মানুষের বসতিপূর্ণ দ্বীপবলয়ের চারপাশে উঁচু বাঁধ দেওয়া ছাড়া। মানুষের সৃষ্টি করা ডিজাস্টার (যেমন নানান ধরনের পরিবেশ দূষণ) সুন্দরবনের মত সংবেদশীল ইকোসিস্টেমকে যখন আঘাত করে তখন তার প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারি। তার জন্য পরিবেশগত সম্ভাব্য ক্ষয় ক্ষতি এবং হৃত পরিবেশ স্বাস্থ্যকে আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তির মাধ্যমে চেষ্টা করলে আয়ত্বে আনতে পারি।

আধুনিক নগরায়ন ও দ্রুত ক্রমবর্ধমান বহু শিল্পের ক্ষতিকর বর্জ্যদ্রব্য পরিশোধন না করেই পরিবেশ ছেড়ে দেওয়া হয় যা নদী-নালা-খাল বেয়ে দূরদূরান্তে পৌঁছে যায়। কলকাতার চর্মনগরীর বর্জ্য, কলকাতা ও হলদিয়া বন্দর, বাংলাদেশের মংলা বন্দর থেকে প্রচুর পরিমানে বর্জ্য, বিশেষ করে অপরিশোধিত চুইয়ে পরা তেল (Petrolium Hydrocarbon) জোয়ারে একটু একটু করে দ্বীপময় সুন্দরবনের খাড়িমাধ্যমে বালুকাবেলায় নয়তো পলিজ পটে (mudflat) ভাটার সময় ছড়িয়ে পড়তে থাকে। অল্প অল্প করে তার বিস্তার ঘটলেও দীর্ঘমেয়াদি পরিবেশনে ভূমিতলে বাসবাসকারি জীবজগতের তা সে অনুউদ্ভিদই হোক বা অদৃশ্য অনুপ্রানিই হোক, উপর ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলে, এবং ছোট ছোট কবচি ও শামুক জাতীয় প্রাণিরা ক্রমে অবলুপ্ত হয়। ফলে খাদ্য হিসাবে এদের ওপর নির্ভরশীল মাছেরা ও পাখিরাও ক্রমশ হারিয়ে যায়। সুন্দরবনের উপকূলবর্তী বন্দরগুলিতে দেশ বিদেশ থেকে বহু পণ্যবাহী জাহাজ আসা যাওয়া করে। আসে বহু তৈলবাহী জাহাজও। এরকম একটি ৩,৫০০ মেট্রিক টন ক্রুড পেট্রলের জাহাজ বাংলাদেশের পশুর নদীর ওপর মংলা বন্দরের পাশের শ্যালা নদীতে নোঙর করেছিল, ভাটা পড়ে যাওয়াতে। ঘন কুয়াশায় ৯ই ডিসেম্বর ভোরে অন্য একটি জাহাজ ঐ তৈলবাহী জাহাজকে ধাক্কা মারলে ট্যাঙ্কার জাহাজটি ভেঙে যায়। ফলে সব তেল ঐ শ্যালা নদীর জলে পড়ে ও জোয়ারের টানে তা আশেপাশের প্রায় ৩৫০ বর্গ কিলোমিটার বাংলাদেশের সুন্দরবনের খাড়ি অঞ্চলে ছড়িয়ে

ছবি ঃ বাংলাদেশ সংবাদ-সংস্থা থেকে প্রাপ্ত।

পড়ে। যে কোন জৈব-পরিবেশে এ ধরনের অপরিশোধিত তেল জলে-স্থলে মিশে গেলে সেই জৈব-পরিবেশ, বিশেষ করে বাদাবনের মত পরিবেশের স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। যেহেতু এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে মানুষ সমেত দেখা-না দেখা বহু কোটি প্রাণ ও তাদের স্বাস্থ্যের সম্পর্ক। এটা ঠিক অন্যান্য উন্নত দেশে এ ধরনের দুর্ঘটনা যাকে Oil spill বলা হয় তার থেকে পরিবেশ স্বাস্থ্যকে সর্বাঙ্গীন মুক্ত করতে তাৎক্ষাণিক বহু রকমের আধুনিক পরিকাঠামো ব্যবহার করা হয়। তাকে বলা হয় Containing Oil spill। বিজ্ঞানীরা গবেষণা তরী (Research vessel) নিয়ে হাজির হন ও সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে যান পারিপার্শ্বিক জল, মাটি, উদ্ভিদ, প্রাণির নমুনা সংগ্রহে যাতে দ্রুত এই আহত পরিবেশের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দেওয়া যায়। নির্ধারন করার চেষ্টা হয় কতদিনে আবার এই ক্ষতিগ্রস্থ জৈব-জল-পরিবেশ মানুষের ব্যবহার যোগ্য হয়ে ওঠে। দুর্ভাগ্যের বিষয় সুন্দরবনের দুপাশে দুই বাংলায় সে ধরনের সেরকম কোন পরিকাঠামোই নেই যে অল্প সময়ের ব্যবধানে ঝাঁপিয়ে পরে এই বিপর্যয়ের মোকাবিলা করতে পারে। বাংলাদেশের সুন্দরবনে শ্যালা নদীর ভৌগোলিক অবস্থান এমন জায়গায় যেখানে আন্তর্জাতিক সাহায্যও সহজে পাওয়ার নয়। বৈদ্যুতিন মাধ্যমে যেটুকু খবর সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তাতে গত ৩১ ডিসেম্বর UNESCO-এর প্রতিনিধি একটি বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞ টিমের মাধ্যমে জল ও মাটির নমুনা সংগ্রহ করিয়েছেন পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে। কিছু উষ্মা প্রকাশ করেছেন সুন্দরবনের সংবেদনশীল এই অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে এধরনের পণ্যবাহী জাহাজ চলাচলের জন্য যেহেতু এই অঞ্চলটি UNESCO স্বীকৃত World Heritage Site।

একজন সমুদ্রবিজ্ঞানী বা পরিবেশবিদ হিসেবে আমার যা ধারণা-এ ধরনের আকষ্মিক আঘাতে বাদাবন পরিবেশের যে সামগ্রিক ক্ষয়ক্ষতি হয় তা সুদূরপ্রসারি। বৈজ্ঞানিক উপায়ে তা অনুধাবন করতে হলে দুই দেশের বা আন্তর্জাতিক স্তরে ম্যানগ্রোভ পরিবেশ বিজ্ঞানীদের বা সমুদ্রবিজ্ঞানীদের দ্বারা সম্মিলিতভাবে নিবিড় পরীক্ষা নিরীক্ষা করা প্রয়োজন এবং হৃত-স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের উপায় স্থানীয় উপযোগী ভাবে ভাবনা চিন্তা করা। যা অন্যান্য উন্নত ও উন্নতশীল দেশ করা হয়।

এ ধরনের দুর্ঘটনায় যে পরিবেশ-ক্ষত হয় তা বহুমাত্রিক। স্বাভাবিকভাবে এই তেলের কণা (Hydrocarbon Particles) নির্মূল হয়ে স্বাভাবিক জলস্বাস্থ্য ফিরে আসতে প্রায় দেড়-দু'মাস লেগে যায় কারণ সমুদ্রজলেই আছে এমন অনুজীব যাদের বলা হয়, Hydrocarbon digesting bacteria যারা ক্ষতিকর তেলের কণার রাসায়নিক কাঠামো ভেঙ্গে জলের বা পরিবেশের স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করে।

কিন্তু তার আগে পরিবেশের যা ক্ষতি হবার তা হয়ে গেছে। বাদাবন পরিবেশবিদ ও সমুদ্রবিজ্ঞানীরা সনাক্ত করতে সাহায্য করবেন এই Oil spill এর জন্য ম্যানগ্রোভ ওয়েটল্যান্ডের মৎস্য প্রজাতির কতটা ক্ষতি হল এবং তার জন্য মৎস্যজীবীদের রুজি রোজগার কত দিনের জন্যে ব্যহত হল। পেট্রলিয়ামে দূষিত মাছ বাজারে বিক্রি নিষিদ্ধ। সুতরাং স্থানীয় ও দূরের মৎস্য ব্যবসায়ীরাও এর জন্য ক্ষতিগ্রস্থ হবেন। সুতরাং এই Oil spill-এর সঙ্গে এক সুদূর প্রসারী সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতি জড়িত।

ম্যানগ্রোভ পরিবেশ বিজ্ঞানীদের কাছে যেটা বেশি আশঙ্কার তা হল এই Oil spill-এর জন্য তাৎক্ষনিক ঐ অঞ্চলের জলজ পরিবেশের সব মাছ, চিংড়ি ও কাঁকড়ার মড়ক। জলে ভাসমান মূল্যবান ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন ও জুপ্ল্যাঙ্কটন-এর সমুহ বিনাশ। ভূমিতলে ও নিকটবর্তী পলিজপটে যে শৈবাল চাদর (algal mat) থাকে তার ও সহযোগী বাস্তুতন্ত্রের সর্বনাশ, কারণ এদের ওপর বিচরণ করে বহু প্রজাতির মাছ, কাঁকড়া ও শামুক জাতীয় প্রাণি। সুন্দরবনের বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে পরা তেলে বালুকাবেলা ও পলিজপটে থাকা একটি পাতলা জৈব আস্তরনের বিনাশ / সমূহ ক্ষতি করে যা সমুদ্রবিজ্ঞানীদের কাছে খুবই মূল্যবান। এই বায়োফিল্ম কোটি কোটি অনুজীবকে আশ্রয় ও সাশ্রয় প্রদান করে যার ওপর নির্ভর করে খাদ্য শৃঙ্খলের ওপরের স্তরের প্রাণিরা।

তবে এই ধরনের Oil spill-এ বাঘ, হরিণ, শুয়োর, কুমির, শুশুক-এর কোন ক্ষতির সম্ভবনা থাকে না। কারণ তারা নিরাপদ দূরত্বে সরে যায়। শ্যালা নদী থেকে ভারতের সীমান্তবর্তী নদী হেড়োভাঙ্গা প্রায় ৫০ কি.মি. পশ্চিমে। মাঝে পশুর নদীর পর আরও চারটে নদী পেরিয়ে শীতের স্তিমিত জোয়ারে এই অয়েল স্পিলের প্রভাব এই বঙ্গের সুন্দরবনে পড়বে না, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। কিন্তু শ্যালা নদীর পারিপার্শ্ব বাদাবন গভীর সুন্দরবনের অংশ। সেখানে জলে-স্থলে ও ভূমিতলে এই অয়েল স্পিল এর দরুন সামগ্রিক জীবপরিবেশের যে ক্ষতি হয়েছে সেই ক্ষতি পূরণ করে নীলকণ্ঠ সুন্দরবন ধীরে ধীরে আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসবে, মানুষের সাহায্য ছাড়াই। বাদাবনের প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেনের যোগানদার ভূমিতলে বিস্তৃত যে অনুশৈবাল চাদরের আস্তরণ তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর আবার পুনর্বাসন পাবে। পরিশ্রুত জলে আমদানী হবে সমুদ্র জোয়ার জলে ভেসে আসা ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনের। মাস কয়েকের মধ্যেই সর্বংসহা সুন্দরবনের আহত স্বাস্থ্য স্বাভাবিক হয়ে আসবে।